মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩০॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i1-2

DOI: 10.62328/sp.v59i1-2.7
প্রবন্ধ জমাদান: ২০ জানুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ৫ মে ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১৪১-১৫৫

শামসুর রাহমানের উপন্যাসে আত্মজৈবনিক অনুষঙ্গ

মাহফুজা মাহবুব
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: mahfujamahbub.du@gmail.com

সারসংক্ষেপ

পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতার অবিসংবাদিত কবি শামসুর রাহমান। জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া জাতীয় ও বৈশ্বিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনের অসংগতি, উত্থান-পতন কবির মানসলোকে যে আলোড়ন তুলেছে তা প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বেড়ে ওঠা শামসুর রাহমান ছিলেন বড় বেশি সমকালস্পর্শী। দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে এই কবির রচিত উপন্যাস চারটি। কবিসুলভ গীতিময়তা, মনোময় কাব্যিকতা ও দক্ষ প্রাকরণিক সৌকর্যে উপন্যাসগুলো হয়ে উঠেছে তাঁর যাপিত জীবনের শিল্পিত ভাষ্য। মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনা মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, এবং তার প্রভাবে ব্যক্তিমানসে জন্ম নিয়েছিল অপ্রাপ্তি, আত্মপীড়ন, আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্তঃসারশূন্যতা; তা-ই ভাষারূপ পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে। কবিতায় বারবার 'আমি' উচ্চারণ করা এই সাহিত্যিকের উপন্যাস কীভাবে আত্মজৈবনিক অনুষঙ্গের সন্নিবেশে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেটির অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

মূলশব্দ

আত্মজৈবনিক উপন্যাস, নাগরিক জীবন, ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা, *কালের ধুলোয় লেখা*, *অদ্ভুত আঁধার এক*, *অক্টোপাস*, উপন্যাসে বাস্তব চরিত্র, কবির উপন্যাস।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিরলপ্রজ ব্যক্তিত্ব শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কবিতার পুরোধা ব্যক্তিত্ব তিনি। তাঁর কাব্যসাধনার কালসীমা প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরিব্যাপ্ত। তিনি ছিলেন প্রবলভাবে সমকাল-সচেতন। বাংলাদেশের মূলধারার প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আত্মিক ও আন্তরিক। সমকালের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, অর্জন-বিসর্জনের উপস্থাপনায় তাঁর সাহিত্য সমৃদ্ধ। প্রধানত কবি হিসেবে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা পেলেও কথাসাহিত্য, বিশেষত উপন্যাস রচনায়ও তিনি প্রদর্শন করেছেন অসামান্য পারদর্শিতা। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রচিত্রণে প্রযুক্ত হয়েছে যাপিত জীবনাভিজ্ঞতার শিল্পিত বয়ান।

শামসুর রাহমান সাহিত্যচর্চা করেছেন প্রায় অর্ধ শতকেরও অধিক সময়। দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের সবচেয়ে দ্যুতিময় সৃষ্টি তাঁর কাব্যকলা। কবিতাকে তিনি তাঁর মর্মমূলে ধারণ করেছেন, কবিতার সাথে নিবিড়ভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন। তাঁর নিরলস কাব্যসাধনা ও নিষ্ঠার কথা তিনি জানিয়েছেন আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *কালের ধুলোয় লেখায়*। বলেছেন—

> যত ঘোরাঘুরিই করতাম, আড্ডা দিতাম, কবিতাকে অবহেলা করিনি কোনও দিন। কারণ কাব্যলক্ষ্মী যে বিন্দুমাত্র অমনোযোগ কিংবা অবহেলা বরদাশত করেন না, তা আমার জানতে বাকি ছিল না। যখন যেখানেই যাই না কেন, ইয়ারদের সঙ্গে যত গল্পগুজবে মেতে থাকি না কেন হঠাৎ দৃষ্টিপথে ভেসে উঠত কাব্যলক্ষ্মীর উপস্থিতি। (শামসুর ২০০৭: ১২৪)

তাঁর রচিত ও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ৬৭টি, উপন্যাস ৪টি, ছড়ার বই ৭টি এবং অনুবাদগ্রন্থ ৬টি। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* দিয়েই কবিতার 'রুপালি স্নান' সেরে ফেলেন তিনি। এরপর ক্রমাগত বাংলাদেশের কাব্যধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন নিজের অনন্য কবিপ্রতিভার আলোকচ্ছটায়। ১৯৬২ সালে, কবিজীবনের প্রারম্ভিক সময়েই প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* তাঁকে এনে দিয়েছিল বিরাট এক সম্মাননা; অর্জন করেছিলেন আদমজী সাহিত্য পুরস্কার। উপন্যাস রচনায়ও শামসুর রাহমান তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করেছেন। *অক্টোপাস* (১৯৮৩), *অদ্ভুত আঁধার এক* (১৯৮৫), *নিয়ত মন্তাজ* (১৯৮৫), *এলো সে অবেলায়* (১৯৯৬)—এই চারটি উপন্যাসে তাঁর কালের বাংলাদেশই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমকাল-সংলগ্ন এই সাহিত্যিক তাঁর উপন্যাসেও মূলত বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ক্ষয়-বিপর্যয়, শাহরিক জীবনের বহুবঙ্কিম চোরাগলি, মধ্যবিত্ত মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সময় ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির রূপ-রূপান্তর, ব্যক্তির স্বাভাবিক ও কল্পিত চিন্তার সেতুবন্ধনে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যকার ব্যবধানের চিত্র এঁকেছেন।

শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* প্রকাশের পূর্বেই শিল্প-সাহিত্যাঙ্গনে তিনি ছিলেন সরব। আধুনিক বাংলা কাব্য আন্দোলনের প্রধানতম কবিরা তখন আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী নেতিচেতনার প্রতীকী জগতে। অত্যন্ত তিরিশলগ্ন হয়েও তিনি সমকাল-সংলগ্ন পৃথিবীকেই তাঁর কাব্যে ধারণ করেছিলেন। তাঁর কবিতার ধারা সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ মন্তব্য করেছিলেন, 'স্বপ্নরঞ্জিত মনোবিশ্বের মোহ এবং স্বপ্নসদৃশ প্রতিবেশ-পৃথিবীতে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা শামসুর রাহমানের দুই প্রধান প্রবণতা: প্রথমটি তাঁকে টেনে

নেয় মনোলোক-স্বপ্নলোকে: আর দ্বিতীয়টি তাঁর সামনে মেলে দেয় বস্তুলোকের রাস্তা' (হুমায়ুন ২০০৮: ৪১)। তিনি আরো বলেছেন—

> প্রত্যেক কবিরই থাকে আপন এলাকা-সাম্রাজ্য; শামসুর রাহমানের কবিতাসাম্রাজ্যের নাম একান্ত ব্যক্তিতাজড়িত অব্যবহিত প্রতিবেশপৃথিবী জীবনপূর্ণ সমকাল। তাই তাঁর কবিতায় পাই ব্যক্তিগত কামনাবাসনা এবং সমকালীন জীবন। শুধু ইঙ্গিত-সংকেত প্রতীকে তৃপ্ত হন না তিনি সমকালকে কবিতায় গ্রহণ করতে যেয়ে; পেশ করেন বর্ণনা-বিবরণ, সমকালচিত্র এবং তার সাথে জড়িত করে দেন বক্তব্য এবং ভাষ্য। তাই তাঁর কবিতা হঠাৎ আলোর ঝলক, শান্ত স্নিগ্ধ, প্রশান্তির বদলে সঞ্চার করে বিশ শতকের দ্বিতীয়াংশে বসবাসের তাপ-জ্বালা-দাহ। (হুমায়ুন ২০০৮: ৩৫)

শামসুর রাহমানের কবিতা প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদের এই উক্তি তাঁর রচিত উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর চারটি উপন্যাসই অত্যন্ত সমকালীন জীবনঘনিষ্ঠ এবং দেশ-কাল রাজনীতির নিপুণ উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ। উপন্যাসের কাহিনি বয়নকৌশল, চরিত্রায়ণ, উপন্যাসের বর্ণিত জীবন, তাদের শ্রেণি পেশা এবং পরিণতি সবই একটি নির্দিষ্ট কালের পরিচয়ে বর্ণিত। এই সমকাল-সংলগ্নতার পাশাপাশি আত্মজৈবনিক অনুষঙ্গকে তিনি যেভাবে উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন তা বিস্ময়কর ও অতুলনীয়। চারটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং চরিত্রের জীবনাচরণকে তিনি উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব একটি বোধের দ্বারা। 'সমকালীন বহির্জীবনের সাথে শামসুর রাহমান ওতপ্রোতভাবে গড়িয়ে দিয়েছেন আপন ব্যক্তিতাকে: বারবার 'আমি' উচ্চারণ তাঁর স্বভাব। যার ফলে তাঁর কবিতায় রচিত হয়েছে বিপুল পরিমাণ আত্মবিবরণী, আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মকথনে তিনি বাংলা ভাষায় সম্ভবত অদ্বিতীয়; আপন প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ, ব্যক্তিগত জীবন ও প্রতিবেশ, আত্মীয়-বান্ধব এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত কিছু ঢুকেছে তাঁর কবিতায়' (হুমায়ুন ২০০৮: ৩৫)। কবিতায় তিনি একান্ত নিজস্ব জীবন তুলে ধরেছেন অসামান্য দক্ষতায়। সমকালীন বাস্তবতা ও ব্যক্তিক জীবনের উল্লেখ যেমন বিশিষ্ট করেছে তাঁর কবিতাকে, তেমনি তাঁর চারটি উপন্যাসের বয়ান-বিবৃতিকে করে তুলেছে ভিন্নস্বাদী।

বাংলা সাহিত্যের অনেক কবিই ঔপনাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, শীর্ষ মানের কথাসাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন, এবং উপন্যাসে যুক্ত করেছেন ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। আধুনিক জটিল জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির গদ্যভাষিক রূপায়ণ হয়ে উঠেছে সেসব উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব বাংলা উপন্যাসে আত্মজীবনানুষঙ্গের অসাধারণ গ্রন্থনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এর ফলে পাঠকের রসক্ষুধা যেমন পরিতৃপ্ত হয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁরা একজন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনদর্শন ও সাংস্কৃতিক অভিরুচির সঙ্গেও পরিচিত হতে পেরেছেন। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে জীবনানন্দ দাশের *জলপাইহাটি* (১৯৪৮), *প্রেতিনীর রূপকথা, জীবনপ্রণালী* প্রভৃতি উপন্যাসেরও উল্লেখ করতে হয়। '*মাল্যবান* কে অনেকে আত্মজৈবনিক বলেন; কিন্তু জীবনানন্দ দাশের কোন উপন্যাসটি আত্মজৈবনিক নয়?' (আসমা ২০২২)। আবার বুদ্ধদেব বসুর

মৌলিনাথ উপন্যাসটিকে বলা যেতে পারে কবির আত্মপ্রতিকৃতি; মৌলিনাথ চরিত্রটি কবির নিজস্ব কল্পনারই প্রকাশ। *মৌলিনাথ*-এর আত্মজৈবনিকতা সম্পর্কে বেগম আকতার কামালের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেছেন, 'বুদ্ধদেবের ব্যক্তিজীবন ও অন্তর্লোকের প্রচ্ছন্ন প্রকাশে রচনাটি আত্মজৈবনিক, তাঁর কবিত্বের ইন্দ্রজালে সৃষ্ট মনোজীবনের বাস্তবরূপ' (বেগম আকতার ২০০৭: ১৩৮)। শামসুর রাহমানও চারটি উপন্যাসে তাঁর যাপিত জীবনের কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয় পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন, একান্ত নিজস্ব স্মৃতিময়তা ও অভিজ্ঞতা এসব উপন্যাসে শিল্পরূপ পেয়েছে। একই সাথে, 'কবির উপন্যাস নামে সাহিত্যের রন্ধনশালায় যে উপাদেয় রুচি পরিবর্তনীয় খাবারটির সন্ধান মেলে তার গড়পড়তা উদাহরণ হতে পারে শামসুর রাহমানের উপন্যাস চতুষ্টয়।' (তানজীম ২০১০: ২৭৫)

শামসুর রাহমানের প্রকাশিত প্রথম এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস *অক্টোপাস* (১৯৮৩)। কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রায় দুই দশক পরে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। যে সময়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন, সে সময়ে স্বদেশ চলছে 'উদ্ভট উটের পিঠে'। বিরূপ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের অস্বাভাবিকতা, বিরুদ্ধ সময়ের অভিঘাতে একজন লেখকের জীবনের ও মনোজগতের টানাপোড়েন যেন *অক্টোপাসের* পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে। *অক্টোপাস* নামটির ভেতরেই রয়েছে বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরা একটি প্রাণীর অস্বস্তি ও ভয়। আদতে খুব নিরীহ প্রাণী হলেও অক্টোপাসের কবল থেকে, অক্টোপাসের আটটি বাহুর পেষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করা ভীষণ দুঃসহ। আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা, যুগের চাপে ক্রম-সংকুচিত হয়ে আসা জীবন, সময়ের অন্ধকারে দিশেহারা মানুষের জীবিকার সংকট, সবকিছুর অন্তর্বয়ান *অক্টোপাস* উপন্যাস। উপন্যাসটিতে বাস্তব জীবনের নানান উপকরণ কবি সংযোজন করেছেন কাহিনিকে পূর্ণতা প্রদানের প্রয়োজনে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ইশতিয়াক হোসেন। পেশায় ইশতিয়াক একজন লেখক। একজন প্রথিতযশা লেখক যখন আরেক জন লেখকের জীবনযাপন চিত্র তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত করেন, তখন স্বভাবতই সেখানে তাঁর নিজস্ব যাপিত জীবনের উত্থান-পতন, টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিপর্যয়ের চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। ইশতিয়াক হোসেনের সাহিত্যজগতে বিচরণ, ব্যক্তি ইশতিয়াকের সাহিত্যের সঙ্গে দিনাতিপাত করার যে প্রবণতা, সেটিকে মেলানো যায় খোদ শামসুর রাহমানের সাথেই। উপন্যাসের শুরুতে শামসুর রাহমান ইশতিয়াকের পরিচয় জানান দেন তার সাহিত্যচর্চার প্রতি ঝোঁকের কথা উল্লেখ করে—একজন লেখক হিসেবে হেঁজিপেঁজি কেউ নন, ইতোমধ্যেই তাঁর বেশ নামডাক হয়েছে। প্রকাশকদের দোরে ধরনা দিতে দিতে জুতোর সোল ক্ষয় করতে হয়নি তাঁকে, ভাগ্য তাঁর প্রতি সুপ্রসন্নই বলা যায়। একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিকের ঈদ সংখ্যায় তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশক তাঁর লেখা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। স্বল্প সময়ে পরিচিতি পাওয়া ইশতিয়াক তাই নামজাদা লেখক; রুচিশীল পাঠকগোষ্ঠী তাঁর লেখা পছন্দ করে, এমনকি সমালোচকদের নেক নজর পড়েছে তাঁর ওপর। কিন্তু তিরিশ দিনে তিনটি উপন্যাস লিখে ফেলার তেলেসমাতি ক্ষমতা নিয়ে জন্মানো জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকও ইশতিয়াককে বলা চলে না।

তরুণ কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরপরই সাহিত্যবোদ্ধা, সমালোচক ও পাঠকদের নজরে এসেছিলেন শামসুর রাহমান নিজেও। তাঁর আত্মজীবনী *কালের ধুলোয় লেখা* গ্রন্থে সহজেই চোখে পড়ে তাঁর তারুণ্যের, বিশেষত সাহিত্যচর্চার শুরুর দিকের সেসব অভিজ্ঞতার কথা। একটি ঘটনার মাধ্যমে ইশতিয়াক হোসেনের সঙ্গে কবি শামসুর রাহমানের যাপিত জীবনের মিল প্রত্যক্ষ করা যায়:

> পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে আমার 'রুপালি স্নান', 'মনে মনে', 'তার শয্যার পাশে' ইত্যাদি কবিতা বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলছি। একদিন কলকাতায় 'কবিতাভবনে' বুদ্ধদেব বসু আমাকে আলাপ-আলোচনা কালে একটি কথা বলেছিলেন 'কবিতা'র ১৯৫২ সালের জুন মাসের সংখ্যাটির বিষয়ে। সেই সংখ্যায় আমার 'মনে মনে' এবং 'তার শয্যার পাশে' শীর্ষক দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যায় বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অশোকবিজয় রাহা, ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, অরুণ কুমার সরকার, রাজলক্ষ্মী দেবী, লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু সংখ্যাটি শুরু করতে চেয়েছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা দিয়ে। কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমার কবিতা দুটি দিয়ে 'কবিতা' পত্রিকার সেই সংখ্যাটি শুরু করার পরামর্শ দিলেন বুদ্ধদেব বসুকে। কারণ তাঁর মতে আমার কবিতা দুটিই সেই সংখ্যার শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাই, বুদ্ধদেব বসু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতটিকেই সম্মান জানালেন। ... সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' পত্রিকাতেও আমার কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। 'পূর্বাশা'র প্রতিটি সংখ্যা শুরু হতো একটি মূল্যবান প্রবন্ধ দিয়ে। এটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই পত্রিকার। একবার নিয়ম ভঙ্গ করে সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'পূর্বাশা'র একটি সংখ্যা শুরু করেছিলেন আমার 'এ্যাপোলোর জন্য' কবিতাটি দিয়ে। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি বুদ্ধদেব বসু এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো সাহিত্যস্রষ্টা ও গুণীজনের প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেয়েছি একজন তরুণ কবি হিসেবে। (শামসুর ২০০৪: ১২৫)

তরুণ কবি হিসেবে শুরুতেই সমালোচকের দৃষ্টিতে এত প্রশংসা, গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বীকৃতির দ্বারা তিনি ইশতিয়াক হোসেনের লেখকসত্তাকে উদ্ভাসিত করেছেন মূলত তাঁর নিজের কবিজীবনের প্রারম্ভের ঘটনাবলিকে বিশিষ্ট করে তোলার জন্য।

ইশতিয়াক হোসেনের স্বভাব, সাহিত্যের প্রতি তার আকর্ষণ, গভীর মনোনিবেশ কবি শামসুর রাহমানের জীবনের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। উপন্যাস রচনার শেষ পর্যায়ে সেই উপন্যাসের চরিত্র লোপার বিচ্ছেদে বিহ্বল হয়ে ওঠেন ইশতিয়াক। সাহিত্যের এই একটি চরিত্র যেন হয়ে উঠেছে ইশতিয়াকের নিত্যজীবনের সঙ্গী। কল্পনায় তিনি লোপার সঙ্গে লিপ্ত হন মনোকথনে:

> লোপা, তুমি আমাকে ঘুমাতে দাও লক্ষ্মীটি। অমন করে তাকিও না আমার দিকে আমার ঘুমানো দরকার,' সাহিত্যিক ইশতিয়াক মিনতি জানায় তার অক্ষর প্রতিমাকে। প্রতিমা অনড়, নাছোড়। (শামসুর ২০২০: ১৩)

এমন অনড় অক্ষরপ্রতিমার সঙ্গে বসবাস করেছেন কবি শামসুর রাহমান দীর্ঘকাল; যাকে তিনি বলেছেন 'কাব্যলক্ষ্মী'। লোপার প্রতি ইশতিয়াকের মুগ্ধতা ও ব্যাকুলতা প্রকৃতপক্ষে কবির মনেরই ব্যাকুলতা:

> এভাবেই আমি কবিতা লেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। কত উদ্বিগ্ন দিন, কত বিনিদ্র রাত কাব্যলক্ষ্মী আমায় নিয়ে খেলা করেন, যেমন বিড়াল ইঁদুরকে নিয়ে মেতে ওঠে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, নিজের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করার পর পেয়ে যাই কাব্যলক্ষ্মী বর, ক্রমশ পুষ্পিত হয়ে উঠে কবিতার খাতা। (শামসুর ২০২০: ১১৪)

কবি-হৃদয়ের উচাটন, সাহিত্যের সাথে দিনাতিপাত করার অদম্য তাগিদ ইশতিয়াক হোসেনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তিনি। ইশতিয়াক হোসেনের কর্মজীবন, আর্থিক টানাপোড়েন ও সাহিত্যভাবনায় শামসুর রাহমানের ব্যক্তিত্বের ছাপ প্রবলভাবে মুদ্রিত। ইশতিয়াক একটি বেসরকারি অফিসে মাঝারি গোছের চাকরিতে কর্মরত। দশটা-পাঁচটার কর্মজোয়াল তাঁর কাঁধে চাপানো। কিন্তু এই বাড়তি বোঝাটুকু বহন না করার কোনো উপায় তাঁর নেই। ইশতিয়াক সেই অর্থে এখনো বিশিষ্ট লেখক নয়। শুধু প্রকাশকের টাকা দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেয়েছেন তিনি বারবার। দেশের প্রকাশনা ব্যবস্থার করুণ অবস্থা চিত্রিত হয়েছে ইশতিয়াকের আর্থিক চালচিত্রে। প্রকাশকের দহলিজে ধরনা দিয়েও তখন সাহিত্যিকের কোনো ফায়দা হয়নি। দহলিজে হাজির হলেই জনাব প্রকাশক এক গাল হেসে কৃত্রিম অভ্যর্থনা জানান, ব্যস্ত হয়ে ওঠেন চা-বিস্কুট আনানোর জন্য, কিন্তু অর্থপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা থাকে না। বরং সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে সাহিত্যিককে টাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হয়। এরপরেও শুনতে হয় যে বাজার মন্দা, ব্যবসা লাটে উঠেছে। কিন্তু ইশতিয়াক এটিও জানেন, জনাব প্রকাশক তাঁর রয়েলটি থেকে সামান্য কিছু টাকা দিতে পারবেন না, অতটা খারাপ পরিস্থিতিও বাজারের নয়। প্রকাশনা জগতের এই নেতিবাচক বাস্তবতা অস্বীকার বা নজরান্দাজ করার কোনো উপায় নেই। বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পে লেখক ও প্রকাশকের সম্পর্কের অস্বচ্ছতা একটি বাস্তব এবং নির্মম সত্য। লেখক তাঁর মেধা, আবেগ-অনুভূতি, শ্রম-ঘামের সমন্বয়ে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। কিন্তু তাঁর বইয়ের প্রাপ্ত সম্মানি থেকে তাঁকে অনেক সময় বঞ্চিত হতে হয়।

উপন্যাসে ইশতিয়াক হোসেন তাঁর স্ত্রী ইয়াসমিনের মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে বারবার উপেক্ষা করেছেন। সচেতনভাবে চেষ্টা করেছেন পৃথিবীতে তার উত্তরাধিকারী না আনার জন্য। এর পেছনের কারণ ছিল অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, সংসারের নানা মাত্রিক অভাব। সাহিত্যিকের ক্ষুদ্র আয় দিয়ে নতুন প্রাণের আগমনকে ইশতিয়াক স্বাগত জানাতে পারেননি। এদিকে শামসুর রাহমানও ব্যক্তিজীবনে একইভাবে অর্থসংকটে ভুগেছেন। প্রথম সন্তানের জন্মের অব্যবহিত পরেই এই সংকট ব্যাপকভাবে ঘনীভূত হতে শুরু করে—

> অনেক আগে টাকাকড়িকে আমি তেমন আমল দেইনি। কিন্তু আমার প্রথম সন্তান সুমির জন্মের পর থেকে অর্থ যে কত অর্থময় তা একটু আধটু করে টের পেতে শুরু করি। তাছাড়া স্ত্রীর এমন কোনও কোনও জিনিসের প্রয়োজন হয় যা সে মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে

> না, নিচু স্বরে শুধু আমাকেই জানাতে পারে। কবিতা লিখে কোনও কোনও পত্রিকা থেকে সামান্য কিছু পাই তা দিয়ে প্রয়োজনের গহ্বর ভরা খুবই মুশকিল। (শামসুর ২০০৭: ১২৭)

ইশতিয়াক হোসেনের পরিবেশ-প্রতিবেশ, তার বন্ধু প্রভৃতির বর্ণনায় কবির নিজস্ব জীবনের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। ইশতিয়াকের বাড়ি ছিল পুরান ঢাকার সাত রওজার গলিতে, আর শামসুর রাহমানের জীবনের বড় অংশ অতিবাহিত হয়েছে পুরান ঢাকার আশেক লেনে, মাহুতটুলিতে। উপন্যাসে ইশতিয়াককে দিয়ে শামসুর রাহমান যেন নিজের নাগরিক জীবনদৃষ্টি ও মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের প্রতি আকর্ষণের কথাই ব্যক্ত করেছেন। ইশতিয়াকের সহকর্মী তোসাররফ আলীর মৃত্যুর পর তাঁর জায়গায় নতুন সহকর্মী হিসেবে যোগদান করা ইশতিয়াকের সমবয়সী জনাব এহসান চৌধুরীর সাথে ইশতিয়াকের সাহিত্যকেন্দ্রিক যে আলোচনা হয়, সেই আলোচনায় এটি বোঝা যায় ইশতিয়াক সমালোচনা গ্রহণে উদার এবং তাঁর লেখার নির্দয়তম সমালোচক তিনি নিজেই। কিন্তু সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে ইশতিয়াকের সাহিত্যের যে ত্রুটি তা এহসানের বক্তব্যে হয়ে ওঠে স্পষ্ট:

> আপনার লেখা সম্পর্কে একটি নালিশ আমার মনে জমে আছে বেশ কিছুদিন থেকে। আপনার লেখায় মেহনতি মানুষের কোন ছবি পাওয়া যায় না, ওদের কথা যেন আপনি পাশ কাটিয়ে যেতে চান। আপনি মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতার কথা লিখেছেন, যারা সর্বহারা, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, ওরা অনুপস্থিত আপনার উপন্যাসে। (শামসুর ২০২০: ৪৫)

ইশতিয়াক হোসেন অকপটে মেনে নিয়েছেন পাঠকের অভিযোগ। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন, যে জীবন নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা নেই, যে জীবনকে তিনি দেখেননি, সেটা সাহিত্যে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এমনটা করলে তা নিজের সাথেই প্রতারণা বলে গণ্য হবে। তৃতীয় বিশ্বের লেখকদের জনগণের কথা মাথায় রেখে সাহিত্য রচনা করতে হবে, শুধুই নিম্নবর্গকে তুলে ধরতে হবে লেখায়, এটি তিনি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন। সর্বহারাদের উপস্থিতি ছাড়াও যে সাহিত্য শিল্পসম্মত হতে পারে, এটি তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। লেখক শামসুর রাহমানও জীবনে অসংখ্য সময় তাঁর লেখায় নিম্নবর্গের অনুপস্থিতি, মধ্যবিত্তের আধিক্য নিয়ে নানান অভিযোগ-অনুযোগে পীড়িত হয়েছেন। ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রামে আয়োজিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে তৎকালীন বরেণ্য সাহিত্যিকদের মিলনমেলায় তিনি খোদ পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সে দিনের স্মৃতি স্মরণ করে আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'সম্মেলনে কবি জসীমউদ্‌দীন আধুনিক কবিতার বিপক্ষে বলতে গিয়ে আমার সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেন; উত্থাপন করেন দুর্বোধ্যতার এবং আমার কবিতা মাটি-সংলগ্ন নয় বলে রায় দেন।' (শামসুর ২০০৭: ১২১)

এহসান চৌধুরীর অভিযোগের ও সমালোচনার সূত্র ধরে পাঠকের পরিচয় হয় ইশতিয়াকের বন্ধু এবং বিখ্যাত লেখক সৈয়দ নওশাদ করিমের সাথে, যে নওশাদ করিম সব্যসাচী লেখক এবং ইশতিয়াকের অন্যতম সুহৃদ। ইশতিয়াকের চেয়ে তিন-চার বছরের বড়, অত্যন্ত ফর্সা, টিকোলো নাক, মাথায় কাঁচাপাকা চুলের অধিকারী সৈয়দ নওশাদ করিমের প্রশংসায় লেখক

পঞ্চমুখ। যিনি কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক—সাহিত্যের প্রায় সব শাখাকেই মঞ্জরিত করেছেন শ্রম ও নিষ্ঠায়।

এই নওশাদ করিমকে শামসুর রাহমান অঙ্কন করেছেন তাঁর অত্যন্ত কাছের, বন্ধুস্থানীয় সাহিত্যিক রশীদ করীমের (১৯২৫-২০১১) ছায়ায়। রশীদ করীমের জন্ম শামসুর রাহমানের চার বছর পূর্বে। তিনি বাংলাদেশের প্রথিতযশা একজন সাহিত্যিক। ইশতিয়াক ও নওশাদ করিমের ভেতরে যে অন্তরঙ্গতা বিদ্যমান, শামসুর রাহমান ও রশীদ করিমের ভেতরেও সেটি দৃশ্যমান ছিল। নিজের আত্মজীবনী গ্রন্থে রশীদ করিমকে তিনি বারবার খাঁটি শুভার্থী, প্রকৃত বন্ধু, একান্ত কল্যাণকামী বন্ধু হিসেবে সম্ভাষণ করেছেন, স্বভাবতই স্বল্পভাষী শামসুর রাহমান প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন যে অল্প কজন মানুষের সঙ্গে, রশীদ করিম তাঁদের একজন। এমনকি আর্থিক কষ্টের মুহূর্তে তাঁর থেকে সাহায্য কামনা করতেও কবি বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করেননি। পক্ষাঘাতে শরীরের ডানপাশ অকেজো হয়ে যাওয়া রশীদ করীমের শারীরিক অসুস্থতা ও প্রতিকূলতা কবিকে ভীষণভাবে পীড়িত করেছে। রশীদ করীমের উপন্যাস ও অনুবাদকে তিনি সময়ের শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, বলেছেন:

> আমার আঙুলে গোনা প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে রশীদ করিম অন্যতম। রশীদ করীম কে, আমাদের সমাজে তাঁর গুরুত্ব কতখানি, কেন তিনি অপরিহার্য বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কথাসাহিত্যের আলোচনায় প্রথম দু'জনের নাম উচ্চারিত হলেও তাঁর নামটি এসে পড়বে অবধারিতভাবেই। কেন এসে যাবে তা যারা রশীদ করীমের একটি দুটি উপন্যাস পড়েছেন তারাই বিলক্ষণ বুঝতে পারবেন (শামসুর ২০০৭: ২৫২)

অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫) উপন্যাসটি শামসুর রাহমানের আত্মজৈবনিকতা ও সমকাল মনস্কতার উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। উপন্যাসের নামকরণ তিনি করেছেন জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) আট পঙ্‌ক্তির সেই বিশেষ কবিতা—'অদ্ভুত আঁধার এক'-এর শিরোনামে। জীবনানন্দ দাশ প্রতিকূল সময়ের ঊষরতাকে বন্দি করতে চেয়েছিলেন তাঁর এই কবিতায়। আর ১৯৭১ সালের ঘন অন্ধকারময় সময়কে শামসুর রাহমান প্রকাশ করেছেন এই উপন্যাসের অবয়বে। কবির জীবন এবং স্বদেশবাসীর জীবনে নেমে আসা নিকষ কালো আঁধারের ঔপন্যাসিক সংস্করণ এটি। *কবিতা এক ধরনের আশ্রয়* গ্রন্থের 'কী করে বন্দী শিবির থেকে লিখেছি' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন *বন্দী শিবির থেকে* কাব্যের পটভূমি। সেই পটভূমি আর এই উপন্যাসের কাহিনি ও প্লট প্রায়ই এক। একটি গদ্য আরেকটি কাব্য—এতটুকুই প্রভেদ।

শামসুর রাহমানের উপন্যাসের নায়ক চরিত্রগুলোর সৃজনে কবির বিশেষ একটি ভাবনা লক্ষ করা যায়। 'কবি-ঔপন্যাসিক শামসুর রাহমান তাঁর উপন্যাসগুলোতে নায়ক চরিত্রের আড়ালে কবি শামসুর রাহমানের 'সেলফপোর্ট্রেট' রচনা করার আত্মদর্শন করেছেন অবিরাম' (জাহিদ ২০১৩: ১৭১)। এ কথা ঠিক যে, চারটি উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের সাথেই শামসুর রাহমান নিজেকে একাকার করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু *অদ্ভুত আঁধার এক*-এর নায়ক নাদিম ইউসুফ আদতেই কবির নিজস্ব প্রকাশ। নাদিম ইউসুফকে তিনি তৈরি করেছেন নিজের

অনুভূতি, আবেগ, ব্যক্তিত্ব ও কর্মময়তার আদলে। নাদিমের পরিচয় প্রদান করতে তিনি লিখেছেন—'নাদিম ইউসুফ কবি। সে এদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। তার পাঁচটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে' (শামসুর ২০২০: ৮৩)। এদিকে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে শামসুর রাহমানের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যাও পাঁচটি; যথা: *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০), *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩); *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৬); *নিরালোকে দিব্যরথ* (১৯৬৮) এবং *নিজ বাসভূমে* (১৯৭০)। উপন্যাসে নাদিম ইউসুফের পিতৃবিয়োগ হয়েছে যুদ্ধের চার বছর পূর্বেই। আর শামসুর রাহমানের পিতা মোখলেসুর রহমান চৌধুরীও মৃত্যুবরণ করেন ১৯৬৭ সালেই, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চার বছর পূর্বে। এই উপন্যাসে বর্ণিত অনেক ঘটনা সরাসরি শামসুর রাহমানের ব্যক্তিজীবন থেকেই গৃহীত। তাঁর আত্মজীবনী *কালের ধুলোয় লেখা*র সঙ্গে এই উপন্যাসের কিছু সাদৃশ্যমূলক ঘটনাবলি নিচে উপস্থাপন করা হচ্ছে:

ক. *কালের ধুলোয় লেখা*:

আব্বা জীবিকা নির্বাহের জন্য ঢাকা শহরে বসবাস করতেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত আমাদের গ্রামের বাড়িতে, পাড়াতলীতে। গ্রামীণ পরিবেশে থাকতে পারলে তিনি মুক্তির স্বাদ পেতেন। (শামসুর ২০০৭: ২৭)

অদ্ভুত আঁধার এক:

বড় সাধ করে আব্বা এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন এখানে, পলাশতলীতে। ... আব্বা শহরে থেকেও পলাশতলীর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে চেয়েছিলেন। পলাশতলীতে জন্মেছিলেন তিনি। এখানেই তাঁর পূর্বপুরুষের ভিটা, বাপদাদার কবর। (শামসুর ২০২০: ৮১)

খ. *কালের ধুলোয় লেখা*:

আব্বার নির্দেশ ছিল তাঁর কবর যেন হয় আমাদের গ্রামে আমাদের পারিবারিক গোরস্থানে তাঁর পিতার কবরের পাশে। বাবার ইচ্ছা পূরণের তাগিদে আমরা তাঁর লাশ চায়ের পাতা এবং বরফ দিয়ে সাজিয়ে একটা কফিনে রেখে রওয়ানা হলাম পাড়াতলী গ্রামের উদ্দেশ্যে। ট্রেনে চেপে আমরা আব্বার লাশ নিয়ে পৌঁছালাম ভৈরব স্টেশনে মেঘলা বিকেলে। চতুর্দিকে হাওয়ার দুরন্ত মাতলামি। আমরা দেরি না করে ঝড়ো আবহাওয়ায় আব্বার কফিন নিয়ে নৌকায় উঠে পড়লাম। তখন মানসিক অবস্থা এমন দুর্যোগময় ছিল যে, প্রকৃতির বিরূপতাকে পাত্তা দেয়ার কোন অবকাশ ছিল না, মেঘনার বুক চিরে হাওয়ার ঝাপটা সয়ে নৌকা চলছিল আলুঘাটার দিকে, নৌকা থেকে আলুঘাটায় নেমেই হেঁটে যেতে হয় আমাদের গ্রামের বাড়িতে। নদী সেদিন যে রকম মারমুখী হয়ে উঠেছিল, অন্য কোনওদিন হলে আমি অন্তত মাঝিকে তীর ছেড়ে নৌকা চালাতে বলতাম না। ১৯৬৭ সালের ২৮শে এপ্রিলের পড়তি বিকেলে তেমন চিন্তা মনের কোনও কোণেই ঠাঁই পায় নি। (শামসুর ২০০৭: ২১৮)

অদ্ভুত আঁধার এক:

ঢাকা থেকে মরহুম তমিজউদ্দীন চৌধুরীর ডেডবডি পলাশলীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাঁর এরাদা অনুসারে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে জড়ো হয়েছিল ওরা সবাই। ... মরহুম তমিজউদ্দনের ডেডবডি নিয়ে শুরু হল ওদের ট্রেন যাত্রা। এপ্রিল মাস, ভ্যাপসা গরম। বেশি করে চা পাতা দেওয়া হয়েছে কফিনের ভেতরে। ... কালো মেঘের চামড়ার মত মেঘ। জোর হওয়া বইছে। মাঝি নৌকা ছাড়তে রাজি নয়। ... আকাশে ঘন কালো মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুচ্চমক, কফিন, বুক ঠেলে-আসা কান্না, গলায় কি একটা দলা, ফোলা ফোলা লালচে চোখ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লাশারিকা ... (শামসুর ২০২০: ১১৫)

গ. *কালের ধুলোয় লেখা:*

ইস্কাটনের দিলারা আমার বাল্যসখী হয়নি, হয়েছিল আমার খালাতো বোন হেনা। প্রায় সবসময় সে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, খেলার আগ্রহ প্রকাশ করত। ওর সঙ্গে খেলতে ভালো লাগতো, কিন্তু সে সারাক্ষণ আমার কাছাকাছি থাকুক, এটা আমি চাইতাম না। হেনা কখনও কখনও আমার সঙ্গে স্কুলে যাবার বায়না ধরত। বারণ করলেও শুনত না একদিন সে চুপিসারে আমার পেছনে পেছনে অনেকটা পথ হেঁটে এলো। ... ভারি রাগ হলো হেনার উপর। ইচ্ছে হলো, দিই এক চড় বসিয়ে ওর রাঙা ফুলো ফুলো গালে। আরও ইচ্ছে হলো ওর কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে হিঁচড়ে বাড়ি নিয়ে যাই। কিন্তু ওর ভড়কে যাওয়া চোখ মুখের দিকে তাকাতেই আমার ইচ্ছার ফণা নুয়ে পড়ল। (শামসুর ২০০৭: ৩২)

অদ্ভুত আঁধার এক:

নাদিম কি ভালবাসত সামিনাকে? অনেকেই মনে করত যে, ওদের মধ্যে ভালোবাসা আছে। খালাতো বোনের সঙ্গে প্রেম করার মধ্যে কোনো রোমাঞ্চ নেই, নাদিম এক সময় মনে করত। সামিনা, নাদিম লক্ষ করেছে ছেলেবেলা থেকেই নাদিমকে পছন্দ করত। নাদিমের প্রতি বরাবরই একটা টান ছিল ওর। নাদিম তখন ক্লাস সিক্স কিংবা সেভেনের ছাত্র। তখন সামিনা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই নাদিমের সাথে কাটাত। এই অষ্টপ্রাহরিক ঘেঁষাঘেঁষি নাদিমের ভালো লাগত না। মাঝে মাঝে সে রাগ করত, বকত সামিনাকে। সামিনা ওর রাগারাগি কিংবা গালমন্দ কিছুকেই আমলে নেয়নি। নাদিম যত রাগ করে, সামিনা তত বেশি কাছে এসে যায় ওর। একবার সামিনা বায়না ধরল যে, সে নাদিমের সঙ্গে স্কুলে যাবে। নাদিম কিছুতেই ওকে স্কুলে নিয়ে যাবে না। নাদিম বাড়ি থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু নিল সামিনা লুকিয়ে চুরিয়ে। নাদিম একটুও টের পায়নি। মাঝপথে সামিনা ধরা পড়ে গেল। সামিনাকে দেখে নাদিমের মেজাজ একেবারে খাপ্পা, ঘুষি লাগাবে নাকি একটা! নাকি লাথি মারবে কষে? (শামসুর ২০২০: ৯৬)

ঘ. *কালের ধুলোয় লেখা:*

অসাম্প্রদায়িক হবার শিক্ষা পেয়েছি আব্বার কাছে। তিনি কখনও হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে আমাদের সামনে বড় করে তুলে ধরেননি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সবাই যে একই মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত এটা তিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন। মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারাটাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই বিবেচনা তাঁর মনে গ্রন্থপাঠের ফলে গড়ে ওঠেনি। কেননা, তিনি বেশি পড়াশোনা করেননি। ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়েছিলেন। তাঁর

> বড় ভাই ফী পাঠাননি বলে আব্বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হন। ... আমরা যাকে আমাদের গ্রামে কৈবর্তদের প্রাণ রক্ষার জন্য একা বন্দুক হাতে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেখেছি, যাঁকে দেখেছি আমাদের গ্রামের হিন্দু ম্যানেজারকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাকে নিজের বাসায় আশ্রয় দিতে মাসের পর মাস, তাঁর এই জীবনচর্যাই আমাদের বিভ্রান্ত কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেয়নি। (শামসুর ২০০৭: ২২)

> *অদ্ভুত আঁধার এক:*

> কী আশ্চর্য, এই মুহূর্তে ওর মনে পড়ল—বড় চাচার গাফিলতির জন্য আব্বা মেট্রিক পরীক্ষা দিতে পারেননি। বড় চাচা আব্বাকে পরীক্ষার ফিস পাঠাননি, কথাটা আব্বা গল্পচ্ছলে একদিন বলেছিলেন। ... নাদিমের প্রশান্ত চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ল। জনাব তমিজউদ্দীন চৌধুরীর কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন প্রশান্ত চৌধুরী। অনেক বছর আগের রায়টের সময় প্রশান্ত চৌধুরী নাদিমের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল প্রায় একমাস। তাকে নাদিমের আব্বা লুকিয়ে রেখেছিলেন গুণ্ডাদের খুনী দৃষ্টি হতে। (শামসুর ২০২০: ৯৮)

চারটি ঘটনাংশের পারস্পরিক সাদৃশ্য আর কিছু শব্দচয়নের হুবহু পুনরাবৃত্তি এটিই প্রমাণ করে, শামসুর রাহমান এবং নাদিম ইউসুফ অভিন্ন সত্তা, অভিন্ন পাড়াতলী আর পলাশতলী গ্রাম। তাঁদের ব্যক্তিক, পারিবারিক ও আদর্শিক জীবনের গতিবিধি একই, তাঁদের বেড়ে ওঠার এবং অন্ধকার সময়কে মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতাও অভিন্ন। শামসুর রাহমান প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সময়, পরিবেশ-প্রতিবেশ ও পরিস্থিতি নিজের ব্যক্তিজীবনের মোড়কে মাত্র তেরো বছর পরে উপন্যাস আকারে প্রকাশ করেছেন এ গ্রন্থে।

ব্যক্তিজীবনের এসব সাদৃশ্য ছাড়াও উপন্যাসে নাদিম ইউসুফের স্মৃতিচারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বিষয় সামনে আসে। তাঁর কর্মজীবন-সূত্রে জানা যায় মুক্তিযুদ্ধকালীন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কতটুকু ছিল। নাদিমের স্মৃতিময়তা থেকে সরাসরি পাওয়া যায় পঁচিশে মার্চের কালরাতের ভয়াল নৃশংসতা। উপন্যাসের পাতায় জীবন্ত হয়ে ওঠেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। উপন্যাসে নাদিম ইউসুফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন, শামসুর রাহমানও এই ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। পঁচিশ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান প্রথিতযশা অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো এই অধ্যাপক শুধু ধীমান শিক্ষকই ছিলেন না, ছিলেন বিশিষ্ট ইন্টেলেকচুয়াল, যুক্তিনিষ্ঠ মনের অধিকারী। তাঁর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় নাদিমের স্মৃতিচারণেও—

> আরেক দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান অধ্যাপকের কোনো বক্তব্য সম্পর্কে নাদিম ঝাঁঝালো মন্তব্য করেছিল। এতে তিনি খুশি হতে পারেননি। তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, তারও তো একটা আলাদা ভিউ পয়েন্ট থাকতে পারে এবং সেটি তোমার মতের সঙ্গে মিলবে এমন কোন কথা নেই। সবাই যদি এক মতাবলম্বী হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীটাকে এত ইন্টারেস্টিং প্লেস বলে মনে হবে না আর। ইদানিং পরমতসহিষ্ণুতা খুবই বিরল, নাদিম জানে কিন্তু সবসময় মনে রাখে না। (শামসুর ২০২০: ৮৭)

দৈনিক পদাতিকে কাজ করতে বিরক্তি বোধ করলেও জীবিকার প্রয়োজনে বরাবরই সাংবাদিকতার সঙ্গে ছিলেন নাদিম। ওদিকে শামসুর রাহমানও সাংসারিক প্রয়োজনে *মর্নিং নিউজের* সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এ জন্য কবির মনে এক ধরনের গ্লানিবোধও ছিল। সরাসরিই বলেছেন, 'মর্নিং নিউজ'-এ চাকরি খুঁজেছিলাম এবং করেছিলাম কিছুকাল—তা জীবিকার তাগিদেই। অন্য কোনও পত্রিকা আমাকে চাকরি দেয়নি' (শামসুর ২০০৭: ১৩)। বেকার অবস্থায় বিয়ে, সন্তানের পিতা হওয়ার পরেও বেকারত্বের অভিশাপ না ঘোচা, কবিতার নেশা মাথায় চাপিয়ে সাংবাদিকতাকে পেশাজীবনে গ্রহণ করার ঘটনাবলিতেও নাদিম ও শামসুর রাহমানের জীবনাচরণগত মিল প্রত্যক্ষ।

শামসুর রাহমানের অবশিষ্ট দুই উপন্যাস *নিয়ত মন্তাজ* (১৯৮৫) এবং *এলো সে অবেলায়* (১৯৯৬)-এর নায়ক চরিত্রে আত্মজৈবনিক অনুষঙ্গ অপেক্ষাকৃত কম। তবুও *নিয়ত মন্তাজ*-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র নাসিম তারেক, যিনি পেশায় চলচ্চিত্র সাংবাদিক, তার মধ্যবিত্ত জীবনাচরণ ও মৃত্যুভাবনায় শামসুর রাহমানের জীবনচর্চার ছাপ বিদ্যমান। *এলো সে অবেলায়* উপন্যাসের কিছু বর্ণনায় সরাসরি সমকালীন বাংলাদেশের জনপ্রিয় বিভিন্ন চরিত্র উঠে এসেছে, যা উপন্যাসের সমকাল সংশ্লিষ্টতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

এলো সে অবেলায় উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জামিল আখতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর পঞ্চাশ পেরোনো জীবনে যুবতী নুসরাত আমানের অবেলায় আগমনের গ্লানিময় প্রসঙ্গ যেমন উপন্যাসে ভাষারূপ পেয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁর জীবনভাবনার মনোময় প্রকাশেও উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ। ফুলার রোডের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় জামিল আখতারের ফ্ল্যাট, নিজেকে কনফার্মড ব্যাচেলর মনে করেন তিনি। তাঁর জীবন কাটে দু-চারজন বন্ধুর সাহচার্যে। কখনও কখনও প্রবল মৃত্যুভয় তাকে আঁকড়ে ধরে। তাঁর তিন বছর আগের স্মৃতিচারণে জানা যায়, কিছুতেই তিনি মন থেকে মৃত্যুর ছায়া ঝেড়ে ফেলতে পারতেন না, সারাক্ষণ মৃত্যু এসে দাঁড়িয়ে থাকত তাঁর দরজায়, পড়ার টেবিলের সামনে, ক্লাসরুমে। যেখানেই যেতেন মৃত্যু যেন তাঁকে অনুসরণ করত। তিনি স্পষ্ট টের পেতেন সারসের মতো পা ফেলে কেউ যেন তাঁর পেছনে আসছে। *আপনজনদের শামসুর রাহমান* শীর্ষক স্মৃতিচারণ গ্রন্থে শামসুর রাহমানের মনের এই ভয়ের কথাই উল্লেখ করে বাংলাদেশের আরেক বিখ্যাত কবি আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯) বলেছেন, 'তিনি মৃত্যুকে খুব ভয় পেতেন। এর যথার্থ কারণ আমি জানি না। আমি বুঝেছি কবিতা পড়ে।' (মাহমুদ ২০০৭: ৪৪)

শামসুর রাহমানের সর্বশেষ উপন্যাস *এলো সে অবেলায়* উপন্যাসটির সমকাললগ্নতা বিশ্লেষণের পূর্বে এটি প্রকাশের প্রেক্ষাপট জেনে নেওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থটির প্রাককথনে শামসুর রাহমান বলেছেন—

> ক' বছর আগে রফিক আজাদ সম্পাদিত 'ঘরে বাইরে' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় 'এলো সে অবেলায়' নামের আমার এই উপন্যাসিকা প্রকাশিত হয়। সেটি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। তাড়াহুড়োর ছাপও ছিল সেই লেখায়। তরুণ কথাশিল্পী এবং প্রকাশক মঈনুল আহসান সাবের

> আমার উপন্যাসিকা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে আগ্রহী এবং উদ্যোগী হলে 'এলো সে অবেলায়' বেশ কিছু পরিমার্জিত এবং পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করে। (বাকী ২০২১: ২০৪)

উপন্যাসটিতে সমসময়ের রাজনীতি ও সাহিত্য বেশ প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। আশির দশকের শেষ দিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান *দৈনিক বাংলা/ বিচিত্রা* থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তিনি। ১৯৭২ সালে *দৈনিক বাংলা* পত্রিকার সহযোগী প্রকাশনা হিসেবে *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* প্রকাশ পায়। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও বিবেকের তাড়নায় সকল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আত্মজীবনী গ্রন্থে ৩০/১১/১৯৮৭ তারিখে তিনি লিখেছিলেন—

> জনগণের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হচ্ছে, ধরপাকড় চলছে পুরোদমে। জরুরি অবস্থার পরোয়ানার বদৌলতে কণ্ঠরোধ করা হয়েছে সংবাদপত্রের। মানুষের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। ... 'দৈনিক বাংলা/বিচিত্রা' থেকে পদত্যাগ আমাকে করতেই হবে। জানি আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হবো, সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে। ... শত অসুবিধা হোক, বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত হওয়ার এই মুহূর্তে একমাত্র পথ হচ্ছে এরশাদ সরকারের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করা। (শামসুর ২০০৭: ৩০৯)

সেই সময়ের রাজনৈতিক উত্তেজনা, গণ-আন্দোলনের প্রসঙ্গ এই উপন্যাসের বিভিন্ন বর্ণনাংশে এভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

আশির দশকে স্বৈরাচার বিরোধী মতাদর্শ নিয়ে গড়ে ওঠা 'জাতীয় কবিতা পরিষদ' প্রসঙ্গও এই উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে। উপন্যাসে জামিল আখতারের অন্যতম সুহৃদ কবি মঈন চৌধুরীর সঙ্গে কথোপকথন-সূত্রে মঈন চৌধুরীর কবিতা পরিষদের প্রতি আত্মসমর্থনমূলক বক্তব্যে প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে। মঈন চৌধুরী জাতীয় কবিতা পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কবিদের উদ্যোগে ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারির ১ ও ২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার টিএসসির মোড়ে প্রথম জাতীয় কবিতা উৎসব আয়োজন করা হয়। এ উৎসবের স্লোগান ছিল 'শৃঙ্খল মুক্তির জন্য কবিতা'। এর প্রতিবাদে এরশাদ সরকারের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৯ সালে ঢাকায় আয়োজিত হয় 'এশিয়া কবিতা উৎসব'। প্রতিবাদী ও তাঁবেদারি কবিদের বাদানুবাদ ছিল তখনকার অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। উপন্যাসের বর্ণনায় জাতীয় কবিতা পরিষদের কর্মকাণ্ডের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সাথে কবির আত্মজীবনীর উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে। উপন্যাসে জামিলের কবিদের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগের প্রত্যুত্তরে মঈন বলেছেন, 'দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কবিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ঢাকায় আনিয়ে তাদের কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দু'দিন, এর মধ্যে রাজনীতির কি আছে? তবে হ্যাঁ, প্রতিবাদী চেতনা থেকেই জাতীয় কবিতা পরিষদের জন্ম হয়েছে।' (শামসুর ২০২০: ১৭০)

এদিকে আত্মজৈবনিক গ্রন্থে প্রথম জাতীয় কবিতা উৎসবের সাফল্য বর্ণনা করে শামসুর রাহমান লিখেছেন—

> দেশের দূরদূরান্ত থেকে অনেক কবি এসেছেন জাতীয় কবিতা উৎসবে যোগদানের জন্য। আজ প্রায় দু'শো কবি কবিতা পাঠ করলেন। সকলের লেখাই যে কবিতা পদবাচ্য, তা বলা

> যাবে না। তাতে কি? এই যে সবাই মিলে একই মঞ্চ থেকে শত শত মানুষকে পদ্য শোনালেন, এইটের একটা আলাদা সৌন্দর্য ও তাৎপর্য আছে বলে মনে করি। (শামসুর ২০০৭: ৩০২)

এই উপন্যাসে জামিল আখতার এবং তাঁর দয়িতা নুসরাত আমানের কথোপকথনেও তৎকালীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিনোদন জগতের অনেক বাস্তব প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। জামিল আখতার ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক আগ্রহ। তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র প্রবন্ধ। নুসরাত আমানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূত্রপাত সাহিত্য, তাঁদের কথোপকথনের চৌম্বক অংশে বাংলাদেশের সাহিত্যের একটি গর্বিত অধ্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে:

> —আপনার লেখার আমি ভক্ত। আপনি অনেক গভীর কথা সহজ ভাবে বলতে পারেন। কোনো কালোয়াতি দেখানোর চেষ্টা করেন না।
>
> —কিন্তু আমি রসকষহীন প্রবন্ধ লিখি, ওসব পড়ে কি আনন্দ পাও তুমি?
>
> —অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রবন্ধ কি রসকষহীন?
>
> —ওরে বাবা, তুমি যে আমাকে মহাজনদের পাশে বসিয়ে দিলে। ফলে ওদের এবং আমার সকলেরই এক ধরনের অপমান হয়। ...
>
> —এ আপনি খামোখাই বলছেন, আজকাল তো প্রবন্ধের বই প্রচুর বিক্রি হয়। বদরুদ্দীন ওমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, হুমায়ুন আজাদ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দের বইয়ের যথেষ্ট ডিমান্ড আছে। ...
>
> —আচ্ছা, রশীদ করিমের উপন্যাস সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?
>
> —তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। (শামসুর ২০২০: ১৬৩)

নুসরাত আমান আর জামিল আখতারের রিকশাভ্রমণ, প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ-সূত্রে উঠে এসেছে তৎকালীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের হালচাল। সুরুচিসম্পন্ন এই দুই চরিত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে বিনোদন, সংগীত জগত এবং এই জগতের প্রতিষ্ঠিত সব সংগীতশিল্পী, যাদের সুরের মূর্ছনায় মোহিত হয়েছে এক সময়ের বাংলাদেশ। যেমন:

> —জানো নুসরাত, আমার না পাপিয়া সারোয়ারের গান খুব ভালো লাগে। ওর কণ্ঠে এক ধরনের সফিস্টিকেশন আছে। আর এটা রবীন্দ্রসংগীতের জন্য খুবই জরুরী। একসময় ফাহমিদার গান খুব ভালো লাগতো আমার। ...
>
> —তোমার রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যার গান ভালো লাগে না? তিনি খুব ভালো গাইছেন আজকাল। ভালো লাগে, ইফফাত আরা। মিতা হকের গানও খুব ভালো লাগে। রাজশাহীর মেয়ে লিসাও ভালো গাইছে। সনজিদা খাতুন আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো গাইছেন। আরেকজন গায়িকার কথা না বললে দারুন অন্যায় হয়ে যাবে, আমি নীলুফার ইয়াসমিনের কথা বলছি। (শামসুর ২০২০: ১৭৪)

অর্থাৎ এই উপন্যাসে কাহিনির অন্তর্বয়নে তৎকালের বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিকগণও প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। সেইসঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেই সময়ের রাজনীতি, সমকালীন বাস্তবতা।

কবি শামসুর রাহমানের কাব্যমানসে তাঁর যাপিত জীবন, পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রভাব স্পষ্ট। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাচরণ ও অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাস চতুষ্টয় বিশিষ্টতা লাভ করেছে আত্মজৈবনিক অনুষঙ্গের উপস্থিতিতে। একই সাথে উপন্যাসগুলো ধারণ করেছে সমকাল ও সমকালীন জীবনের অভিঘাতকে। মুক্তিযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ের যুগজাত আবেগ-অনুভূতির শিল্পিত প্রকাশ তিনি উপন্যাসে করেছেন আত্মজৈবনিকতা ও সমকাল-সংলগ্নতার অপূর্ব মিশেলে।

সহায়কপঞ্জি

আসমা চৌধুরী (২০২২)। 'জীবনানন্দের উপন্যাস: আত্মজৈবনিক উপাদান ও তাঁর সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক বহিঃপ্রকাশ', *সাম্প্রতিক দেশকাল* শিল্প-সাহিত্য (অনলাইন সংস্করণ)। https://tinyurl.com/bdftbnaz

আল মাহমুদ (২০০৭)। 'কালের কবি', *আপনজনদের শামসুর রাহমান*। ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশন।

জাহিদ হাসান সরকার (২০১৩)। 'শামসুর রাহমানের উপন্যাস: কবিস্বভাব ও কাব্যিকতা', *সাহিত্য পত্রিকা* বর্ষ ৫১ সংখ্যা ১। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাকী বিল্লাহ বিকুল (২০২১)। *কথাসাহিত্য ও কবিতা: ভাবনার অন্তস্বর*। ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

বেগম আকতার কামাল (২০০৭)। *কবির উপন্যাস*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

তানজীম আল বায়েজীদ (২০১০)। 'শামসুর রাহমানের উপন্যাস: নিবিড় পাঠ', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ* (শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

শামসুর রাহমান (২০২০)। *উপন্যাস সমগ্র*। ঢাকা: অন্যপ্রকাশ।

শামসুর রাহমান (২০০৭)। *কালের ধুলোয় লেখা*। ঢাকা: অন্যপ্রকাশ।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮)। *শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা*। ঢাকা: আগামী প্রকাশন।